CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH

HSB
স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ৪ সংখ্যা ২ | আইএসএসএন১৭২৯-৩৪৩এক্স | জুন ২০০৬

ভেতরের পাতায় . . .

৭ বাংলাদেশে নিউমোকক্কাল রোগের সার্ভিলেন্স এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এর প্রভাব

১২ ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্বাচিত মাতৃস্বাস্থ্য-সূচক

১৮ সার্ভিলেন্স আপডেট

বাংলাদেশে পরিবারে নারীর প্রতি সহিংসতা

পরিবারে নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা, নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর তার প্রভাব এবং সহিংসতা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে তাঁর কলা-কৌশল সম্পর্কে জানার জন্য আমরা বাংলাদেশের শহর এবং গ্রামে একটি গুণগত গবেষণা এবং ১৫-৪৯ বছর-বয়সী ৩,১৩০ জন মহিলার ওপর একটি জনসংখ্যা-নির্ভর সমীক্ষা পরিচালনা করেছি। সমীক্ষায় শতকরা ষাটজন মহিলা বলেছেন যে, তাঁদের জীবনে তাঁরা হয় শারীরিক অথবা যৌন-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের স্বামীরাই হচ্ছেন নির্যাতনকারী। দুই-তৃতীয়াংশ নির্যাতিত মহিলা কখনো তাঁদের নির্যাতনের কথা কাউকে বলেন নি এবং প্রায় কেউই কখনো কোনো আনুষ্ঠানিক সাহায্যের জন্য কোথাও যান নি। ব্যাপক এই জনস্বাস্থ্য-সমস্যা সমাধানের জন্য নারীর প্রতি সহিংসতার সহায়ক এবং সহিংসতায় ইন্ধন জোগায় এমন মনোভাবে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে সরাসরি কাজ করা প্রয়োজন।

আগের গবেষণাসমূহ থেকে দেখা গেছে যে, স্বামীকর্তৃক নারী-নির্যাতন বাংলাদেশে একটি মারাত্মক সমস্যা। শুলার ও তাঁর সহকর্মীরা গ্রামের গরীব মহিলাদের ওপর তাঁদের স্বামীদের নির্যাতনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন (১)। কেনিগ ও তাঁর সহকর্মীরা সমাজের সব স্তরে নারীর ওপর স্বামী এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের নির্যাতনের সাথে কী কী বিষয় যুক্ত তার ওপর গবেষণা করেছেন (২)। এ-গবেষণাগুলোর কোনোটিতেই শারীরিক নির্যাতন সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আচরণগত কোনো প্রশ্ন করা হয় নি। তাই শারীরিক নির্যাতন বলতে উত্তরদাতারা যে যা বুঝেছেন সে অনুযায়ী নিজেদের মত ব্যক্ত করেছেন। পূর্ববর্তী গবেষণায় নারীর শরীর ও মনের ওপর নির্যাতনের কী প্রভাব পড়ে তা পরিষ্কারভাবে জানা যায় নি। কেনিগ ও তাঁর সহকর্মীরা উল্লেখ করেছেন যে, পরিবারে নারী-নির্যাতনের সাথে নারীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার যে সম্পর্ক রয়েছে তার ওপর সীমিত জ্ঞান প্রচলিত স্বাস্থ্য ও প্রজনন কর্মসূচির আওতায় নারী নির্যাতনসম্পর্কীত কাজ করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় (৩)। তাছাড়া সেবা দেওয়া ছাড়া নারী নির্যাতন বন্ধে আর কী কী করা দরকার সেসব বিষয় এখনো অস্পষ্ট রয়ে গেছে।

বাংলাদেশে পরিবারে নারী-নির্যাতনের ওপর আমরা একটি গবেষণা পরিচালনা করেছি। এ-গবেষণার উদ্দেশ্য ছিলো নারী-নির্যাতনের মাত্রা পরিমাপ করা, নির্যাতনে নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর কী

আইসিডিডিআর,বি:
সেন্টার ফর হেলথ্ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
জিপিও বক্স ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org

প্রভাব পড়ে তার মূল্যায়ন করা এবং নির্যাতনের শিকার মহিলারা কীভাবে নির্যাতন মোকাবেলা করেন সেসব জানা।

২০০১ সালের জুন এবং নভেম্বর মাসের মধ্যে শহর এবং গ্রামের দু'টি এলাকা (উভয় অঞ্চল থেকে একটি করে) থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। আঠারজন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রদানকারীর সাক্ষাৎকার, ১১টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (নয়টি এককভাবে শুধু পুরুষদের সাথে এবং দু'টি শুধুমাত্র মহিলাদের সাথে) এবং ২৩ জন গ্রাম ও ১৫ জন শহরের নির্যাতিত মহিলার সাথে নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গুণগত উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন স্তর এবং শ্রেণীর ১৫ থেকে ৪৯ বছর-বয়সী বিবাহিত এবং অবিবাহিত সবধরনের মহিলাদের ওপর জনসংখ্যা-নির্ভর একটি সমীক্ষার মাধ্যমে সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রথমে দৈবচয়নের ভিত্তিতে গ্রাম থেকে ৪২টি এবং শহর থেকে ৩৯টি গুচ্ছ এলাকা নির্বাচন করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য গুচ্ছ এলাকার পরিমাপ অনুযায়ী আনুপাতিক হারে প্রত্যেকটি এলাকায় বাড়ির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। এরপর আবার দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্রত্যেকটি এলাকা থেকে বাড়ি নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত প্রতিটি বাড়ি থেকে একজন মহিলার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। বাড়িতে সাক্ষাৎকারের জন্য উপযুক্ত একাধিক মহিলা থাকলে সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য দৈবচয়নের ভিত্তিতে তাদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করা হয়।

এই গবেষণায় তথ্যের গোপনীয়তা এবং উত্তরদাতা ও তথ্যসংগ্রহকারী দলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গবেষকদল নানা রকম সতর্কতা অবলম্বন করেছে। খুব ছোট শিশু ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিতে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় নি। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য পরিবারের অন্য কোনো সদস্যকে বা এলাকার অন্য কাউকে জানানো হয় নি।

এ-গবেষণার প্রধান বিষয় ছিলো স্বামীকর্তৃক নারী-নির্যাতনের বিষয়সমূহ সম্পর্কে জানা। এজন্য মহিলাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে আচরণগত এবং সরাসরি কিছু প্রশ্ন করা হয়। যেমন, শারীরিক নির্যাতন সম্পর্কে জানার জন্য একজন নারীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, তাকে কখনও চড় মারা, ধাক্কা দেওয়া, আঘাত করা, লাথি মারা, পিটানো, শ্বাসরোধ করা, পোড়ানো এবং কোনো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের হুমকি দেওয়া বা সত্যি সত্যি আঘাত করা হয়েছে কি না। যৌন-নির্যাতন সম্পর্কে জানার জন্য যেসব প্রশ্ন করা হয় সেগুলো হলো, বল প্রয়োগে যৌন-মিলনে বাধ্য করা হয়েছে কিনা, ভয়ের কারণে যৌন-মিলনে বাধ্য হতে হয়েছে কি না এবং তাঁর কাছে অপমানকর কোনো যৌন কাজে তাকে বাধ্য করা হয়েছে কি না। বিবাহিত এবং অবিবাহিত সব নারীকেই প্রশ্ন করা হয়েছে যে, ১৫ বছর বয়সের আগের এবং পরের কোনো যৌন-নির্যাতনের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে কিনা এবং এধরনের অভিজ্ঞতা থাকলে কে বা কারা তার জন্য দায়ী ছিলো।

সারণি ১: সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্যসমূহ	শহরাঞ্চল সংখ্যা=১,৬০৩	গ্রামাঞ্চল সংখ্যা=১,৫২৭
গড় বয়স	২৯ বছর	৩০ বছর
অবিবাহিত	১৪%	১৩%
কখনো বিয়ে হয়েছে	৮৬%	৮৭%
কখনো স্কুলে যায় নি	১৮%	৩৭%
প্রাথমিক শিক্ষা	১৮%	৩০%
মাধ্যমিক শিক্ষা	৩৩%	২৭%
উচ্চ শিক্ষা	৩০%	৭%
উপার্জন করেন	১৯%	১৯%
মুসলমান	৯৫%	৮৩%

সার্থকভাবে মোট ৩,১৩০ জন মহিলার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। শহর এবং গ্রামের বাড়ি থেকে সাক্ষাৎকার দিতে

অসম্মতি জানায় যথাক্রমে ৬% এবং ১% মহিলা। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ মহিলাই প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। ৮০%-এর বেশি ছিলেন বিবাহিত (সারণি ১)।

বৈবাহিক অবস্থা যাই হোক না কেন (বিবাহিত বা অবিবাহিত) সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ প্রজননক্ষম মহিলা (৬০% শহরে এবং ৬১% গ্রামে) বলেছেন যে, তাদের জীবনের কোনো না কোনো সময়ে তারা শারীরিক বা যৌন-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। শহর এবং গ্রামের মহিলাদের শারীরিক ও যৌন-নির্যাতনের হারে কোনো পার্থক্য নেই (চিত্র ১)। বেশিরভাগ শারীরিকভাবে নির্যাতিত নারীদের স্বামীরাই ছিলেন নির্যাতনকারী (চিত্র ২)।

চিত্র ১: প্রজননক্ষম নারীর ওপর স্বামীর শারীরিক ও যৌন-নির্যাতনের হার

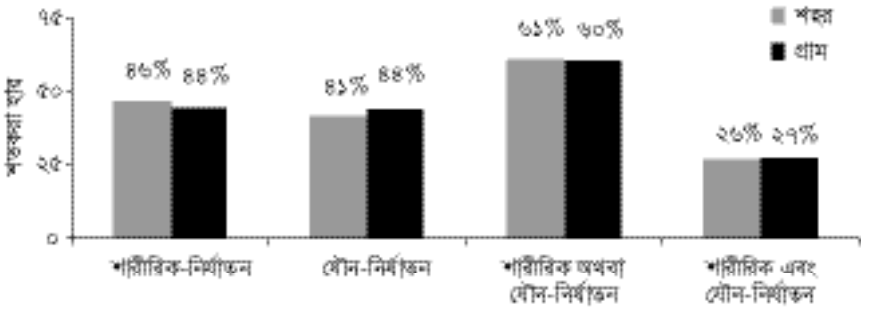

চিত্র ২: ১৫-৪৯ বছর-বয়সী নারীর শারীরিক নির্যাতনকারী

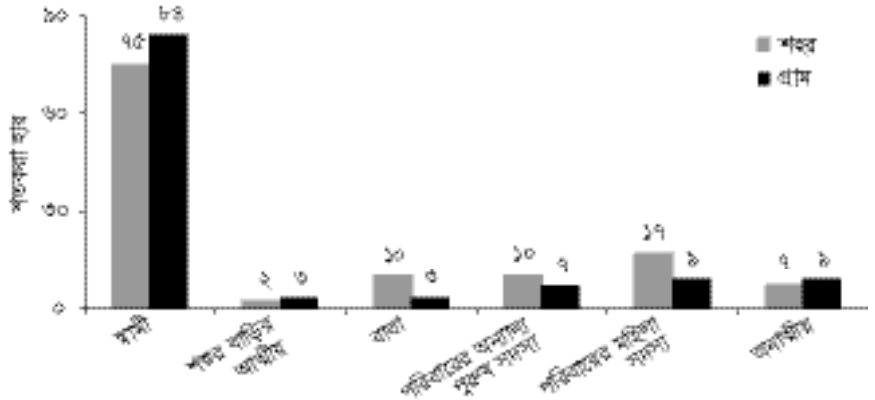

বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে শহরের ৪০% এবং গ্রামের ৪২% জানিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের স্বামীদের হাতে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। শহরের ৩৭% নারী এবং গ্রামের ৫০% নারী স্বামীদের যৌন-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

গ্রাম এবং শহর উভয় এলাকায় ১৯% মহিলা মারাত্মক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ঘুসি মেরে বা অন্য কোনোভাবে আঘাত করে, লাথি মেরে, পিটিয়ে, শ্বাসরোধ করে, পুড়িয়ে বা কোনো

অস্ত্র বা অন্য কিছু দিয়ে আঘাত করে তাঁদের নির্যাতন করা হয়।

শহরের ১৯% এবং গ্রামের ১৬% বিবাহিত মহিলা গত ১২ মাসে স্বামীদের হাতে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একাধিকবার এই নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে (চিত্র ৩ ও ৪)।

শহরের ২৭% এবং গ্রামের ২৫% শারীরিকভাবে নির্যাতিত মহিলা জানিয়েছেন যে, স্বামীর আঘাতে তাঁরা জখম হয়েছেন। কেটে যাওয়া, কালশিটে পড়া, কামড় থেকে আরম্ভ করে কোনো অঙ্গ ভেঙ্গে যাওয়া, দাঁত ভেঙ্গে যাওয়া এবং পুড়ে যাওয়া পর্যন্ত জখমের তথ্য আমরা পেয়েছি।

চিত্র ৩: গত ১২ মাসে শহরে নারীর ওপর স্বামীর শারীরিক নির্যাতন

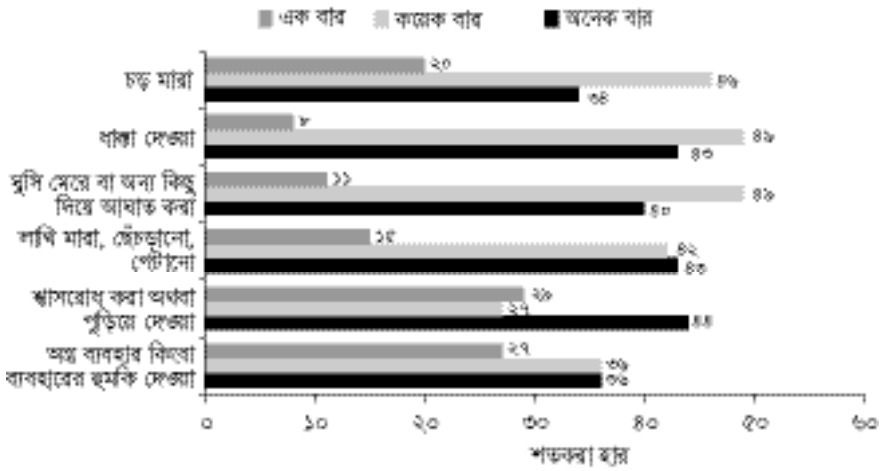

চিত্র ৪: গত ১২ মাসে গ্রামে নারীর ওপর স্বামীর শারীরিক নির্যাতন

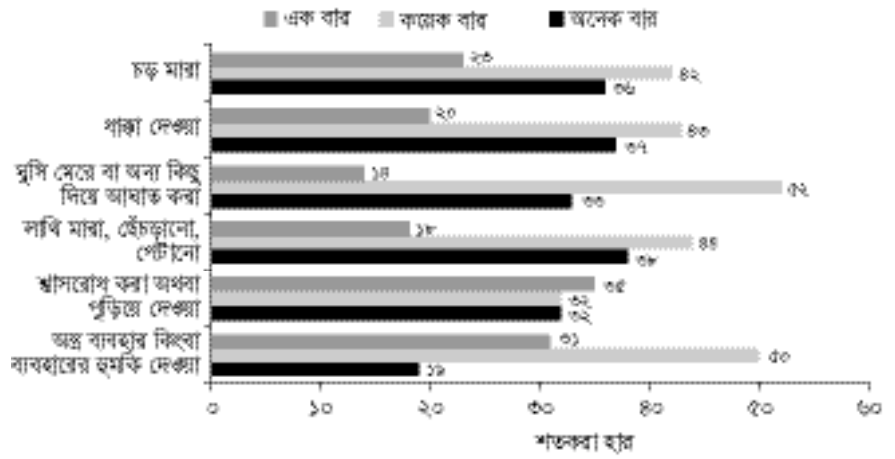

নির্যাতিত এই নারীরা হাঁটায় অসুবিধা (১৮% শহরে এবং ২৪% গ্রামে), ব্যথা (২৬% শহরে এবং ৩৬% গ্রামে), মাথা ঘোরা (৪৪% শহরে এবং ৬৪% গ্রামে) এবং স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়াসহ (১৩% শহরে এবং ২০% গ্রামে) বিভিন্ন রকমের স্বাস্থ্যসমস্যার কথা জানিয়েছেন। একটি লজিস্টিক রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস-এর মাধ্যমে বয়স, শিক্ষার স্তর এবং বসবাসের এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে দেখা গেছে যে, যেসব বিবাহিত নারী নির্যাতিত হন নি তাঁদের তুলনায় স্বামীকর্তৃক শারীরিক অথবা যৌন-নির্যাতনের শিকার নারীদের মধ্যে সম্ভবত দেড়গুণ বেশি হাঁটায় (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ১.২-১.৭) অসুবিধার কথা, ১.৭ গুণ বেশি ব্যথা (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ১.৪-২.০) ও মাথা ঘোরার (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ১.৫-২.১) কথা এবং ১.৪ গুণ বেশি নারী স্মৃতিশক্তি (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ১.২-১.৬) কমে যাওয়ার কথা বলেছেন।

নির্যাতনমুক্ত নারীদের তুলনায় নির্যাতিত নারীরা অপেক্ষাকৃত বেশিবার গর্ভধারণ করেছেন (৩.০ বনাম ২.৫), বেশিবার গর্ভপাত ঘটিয়েছেন (নারী প্রতি ০.১৭ বনাম ০.০৯) এবং তাঁদের শিশুমৃত্যুর হারও ছিলো বেশি (প্রতি ১,০০০ শিশুর মধ্যে ৩৬ বনাম ২৬ জন)।

শহরের যেসব নারী কখনো নির্যাতিত হন নি তাঁদের মধ্যে শতকরা সাতজন আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলেন। আর নির্যাতিত নারীদের মধ্যে এ-হার ছিলো ২১%। গ্রামে কখনো নির্যাতিত হন নি এমন নারীদের ৪% এবং নির্যাতিত নারীদের মধ্যে ১৫% আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলেন। যাঁরা আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা কখনো নির্যাতিত হন নি তাদের তুলনায় (১৪%) নির্যাতিত মহিলাদের মধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টাকারী ছিলেন দ্বিগুণ (২৯%)।

শহর এবং গ্রাম উভয় এলাকায় শারীরিকভাবে নির্যাতিত দুই-তৃতীয়াংশ নারী তাঁদের নির্যাতনের কথা কাউকে বলেন নি এবং প্রায় কেউই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য চান নি। তাঁদের এ নীরবতার কারণগুলো হচ্ছে, অনেকে (৫৭% শহরে এবং ৫২% গ্রামে) এই নির্যাতনকে বিশেষ কিছু মনে করেন নি যে, তা অন্যকে জানাতে হবে, অনেকে (৩০% শহরে এবং ৪০% গ্রামে) আবার কলঙ্কের ভয়ে অথবা কেউ তাঁদের বিশ্বাস করবেনা এই ভয়ে অথবা উল্টো তাঁদেরকেই দোষারোপ করবে এই ভয়ে এ নিয়ে কথা বলেন নি। কেউ কেউ (২৬% শহরে এবং ৩৪% গ্রামে) পরিবারের বদনামের ভয়ে এবং কেউ কেউ (১১% শহরে এবং ১০% গ্রামে) সাহায্য চাইলেও নির্যাতন কমবে না এই বিশ্বাসে নির্যাতনের কথা কাউকে বলেন নি।

যেসব নারী সাহায্য চেয়েছেন তাঁদের সাহায্য চাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো যে, তারা নির্যাতন আর সহ্য করতে পারছিলেন না (৭৯% শহরে এবং ৮৪% গ্রামে)। তাছাড়া কারো সন্তান যখন হুমকির মুখোমুখি হয়েছে অথবা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে (৩২% শহরে এবং ৩৭% গ্রামে) বা নিজে যখন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন অথবা খুন হওয়ার আশঙ্কা করেছেন (২১% শহরে এবং ৩১% গ্রামে) তখন তিনিও সাহায্য চেয়েছেন। যাঁরা সাহায্য চেয়েছেন তাঁরা সাধারণত আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর ওপর নির্ভর করেছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা কথা বলেছেন তাঁদের বাবা-মা (১৮% শহরে এবং ১৯% গ্রামে), ভাইবোন (১৬% শহরে এবং ১৪% গ্রামে) এবং প্রতিবেশীর (১০% শহরে এবং ১২% গ্রামে) সঙ্গে। কিন্তু নির্যাতনের কথা যাঁরা প্রকাশ করেছেন তাঁদের বেশিরভাগই (৬০% শহরে এবং ৫১% গ্রামে) বলেছেন যে, তাঁদেরকে কেউ কোনো সাহায্য করে নি।

পারভীনের ঘটনাটি নির্যাতিত অনেক নারীর অসহায়ত্বের প্রতিফলন। তিনি বলেন, "আমার জন্য এটি কোনো প্রশ্ন নয় যে, আমি নির্যাতন সহ্য করব কি না। খাদ্যের জন্য আমাকে আমার স্বামীর

ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে তা যতই বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটুক না কেন। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। একদিনের এক ঘটনার পর আমি তাকে ত্যাগ করে আমার মায়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। কয়েক মাস পরে আমার স্বামী আমাকে ফিরিয়ে আনতে সেখানে যায়। আমার মা আমাকে কী করে খাওয়াবেন? আমার ভাইদের স্ত্রীরা বললেন, "তুমি এখন কী করবে? আমাদের নিজেদের যার যার সংসার আছে যা আমাদের নিজেদেরকেই চালাতে হয়। আমরা জানি সেখানে তোমার খুব কষ্ট হয়, তবুও সেখানে ফিরে যাওয়াই তোমার জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল।" সুতরাং পারভীন তাঁর স্বামীর সাথে ফিরে গেলেন।

প্রতিবেদক: পাবলিক হেলথ সায়েন্সেস ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি এবং নারীপক্ষ

অর্থানুকুল্য: বাংলাদেশ সরকার ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এর সহযোগিতায় আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট, বাংলাদেশ

মন্তব্য

পূর্ববর্তী গবেষণায় পরিবারে নারী-নির্যাতনের যে উচ্চ হারের কথা বলা হয়েছিলো, এই গবেষণা তাতে সমর্থন যোগাবে (১,৪-৬)। বাংলাদেশে পরিবারে নারী নির্যাতন যে একটি বড় ধরনের স্বাস্থ্য-সমস্যা এই গবেষণা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। স্বামীরাই যেহেতু প্রধান নারী-নির্যাতনকারী, তাই তাঁদেরকে লক্ষ্য করে কার্যকর কর্মসূচি চালু করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে নারী-নির্যাতনের উচ্চমাত্রা থেকে ধারণা করা যায় যে, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নির্যাতনের শিকার। তাই স্বাস্থ্যসেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে নির্যাতিত নারীদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

যেহেতু খুব কম নারীই প্রাতিষ্ঠানিক সেবা নিতে আসেন, সেহেতু শুধুমাত্র প্রচলিত স্বাস্থ্যসেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে নির্যাতিত নারীর জন্য সেবার ব্যবস্থা করলেই হবে না, বরং বর্তমানে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি যা পুরুষদেরকে নারী-নির্যাতনে উদ্বুদ্ধ করে, তা সমূলে বিনাশ করার জন্য নানা ধরনের সৃষ্টিশীল কর্মসূচি চালু করতে হবে। এ-কাজের একটি অংশ হলো, সতর্ক গবেষণার মাধ্যমে জনগণের কাছে কী বার্তা পৌঁছানো যায় এবং কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত তা ঠিক করা। শ্রেণীকক্ষে এবং তার বাইরে গণমাধ্যম ব্যবহার করে এই বার্তাগুলো সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন।

বাংলাদেশে নিউমোকোক্কাল রোগের সার্ভিলেন্স এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এর প্রভাব

স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি (নিউমোকক্কাস) বিশ্বব্যাপী শৈশবকালীন নিউমোনিয়ার একটি বড় কারণ। এই রোগ প্রতিরোধের জন্য নতুন, নিরাপদ এবং কার্যকর টিকা তৈরি হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে নিউমোকক্কাস রোগের প্রকোপ কতটা তা এখনো পরিষ্কার নয়। নিউমোকক্কাস রোগের ওপর আমরা বাংলাদেশের সাতটি হাসপাতালে এবং দু'টি কমিউনিটিতে সার্ভিলেন্স পরিচালনা করেছি। ২০০৪ সালের এপ্রিল এবং ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে আমরা রক্ত এবং স্নায়ুরস (সিএসএফ) পরীক্ষা করে নিউমোকক্কাস রোগের ১১৭টি জীবাণু সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। সাতটি হাসপাতালের সবকটিতে এবং কমিউনিটি সার্ভিলেন্স এলাকায় মারাত্মক নিউমোকক্কাল রোগে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করা হয়। সনাক্তকৃত বেশিরভাগ জীবাণুই (৭২%) কোট্রাইমোক্সাজোল-প্রতিরোধক ছিলো। কমিউনিটি সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে সনাক্তকৃত ৫৮% জীবাণু নয়টি সেরোটাইপসমৃদ্ধ (নাইন-ভ্যালেন্ট) নিউমোকক্কাল কনজুগেট টিকা দ্বারা প্রতিরোধ করা যাবে। বাংলাদেশে শিশুদের বেঁচে থাকার বিষয়টি সত্যিকারভাবে উন্নত করার জন্য নিউমোকক্কাল কনজুগেট টিকার প্রবর্তন এদেশের শিশুদের জীবন রক্ষায় অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশে পাঁচ বছর-বয়সী শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ নিউমোনিয়া (১)। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া একটি শিশু ঠিক কোন জীবাণুতে আক্রান্ত হয়েছিলো তা জানা যেখানে দুষ্কর, সেখানে এটি বিশ্বাস করা হয় যে, বিশ্বব্যাপী শৈশবকালীন নিউমোনিয়া এবং মেনিনজাইটিস-এর দরুন শিশুমৃত্যুর একটি প্রধান কারণ হচ্ছে *স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি* (নিউমোকক্কাস) (২)।

নিউমোকক্কাসের জীবাণুর বাহ্যিক আবরণ (ক্যাপসুল)-এর মলিকুল জীবাণুর প্রকারভেদ অনুসারে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। বর্তমানে যেসব টিকা পাওয়া যায় সেগুলো এই বাহ্যিক আবরণকে লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে। একশটি ভিন্ন ভিন্ন নিউমোকক্কাল সেরোটাইপের মধ্যে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি সেরোটাইপের বিরুদ্ধে এই টিকা কার্যকর। যেহেতু স্বল্পসংখ্যক সেরোটাইপ অধিকাংশ নিউমোকক্কাল রোগের কারণ, সেহেতু সাত থেকে ১১টি সেরোটাইপের বিরুদ্ধে তৈরি টিকা উল্লেখযোগ্যভাবে নিউমোকক্কাল রোগ কমিয়ে আনতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০০০ সাল থেকে নিউমোকক্কাস জীবাণুর সাতটি সেরোটাইপের বিরুদ্ধে কার্যকর একটি টিকা ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এর ফলে সেখানে পাঁচ বছর-বয়সী শিশুদের মধ্যে মারাত্মক নিউমোকক্কাস রোগে আক্রান্তের হার ৭৫% কমে গেছে (৩)। গাম্বিয়ায় নিউমোকক্কাসের নয়টি সেরোটাইপের বিরুদ্ধে কার্যকর একটি টিকা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বুকের এক্স-রের মাধ্যমে নিশ্চিত নিউমোনিয়ায় আক্রান্তের হার ৩৭%, ল্যাবরেটরিতে নিশ্চিত মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্তের হার ৭৭% এবং সার্বিকভাবে শিশুমৃত্যুর হার ১৬% কমেছে (৪)।

ইতোপূর্বেকার হাসপাতাল-ভিত্তিক একটি গবেষণা থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের থেকে প্রাপ্ত নিউমোকক্কাস জীবাণুর সেরোটাইপগুলি টিকাতে অন্তর্ভুক্ত সেরোটাইপগুলি থেকে আলাদা (৫)। তদুপরি বাংলাদেশে কী পরিমাণ নিউমোকক্কাস রোগের প্রকোপ আছে তা পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্তের অভাব রয়েছে, যার ফলে বাংলাদেশে নিউমোকক্কাল রোগের কার্যকর টিকা প্রচলনের ক্ষেত্রে প্রমাণ-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে।

বাংলাদেশে নিউমোকক্কাল রোগের প্রকোপ সম্পর্কে এবং নতুন টিকা প্রচলনের মাধ্যমে কী পরিমাণ রোগকে এই টিকার দ্বারা প্রতিরোধ করা যাবে তা ভালভাবে জানার জন্য সাতটি হাসপাতাল ও দু'টি কমিউনিটিতে আমরা সার্ভিলেন্স পরিচালনা করেছি।

২০০৪ সালের মে মাস থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞানুযায়ী* নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস অথবা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের কাছ থেকে রক্ত ও স্নায়ুরসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। কালচার এবং জীবাণুনাশকের প্রতি সংবেদনশীলতা (এন্টিমাইক্রোবিয়াল সাসেপটিবিলিটি) পরীক্ষার জন্য এসব নমুনা স্থানীয় হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়। নিউমোকক্কাল জীবাণু এবং এর সেরোটাইপ সম্পর্কে জানার জন্য সবকটি হাসপাতাল থেকে সংগৃহীত নিউমোকক্কাল জীবাণু ঢাকা শিশু হাসপাতালে অবস্থিত একটি রেফারেন্স ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়।

২০০৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে ঢাকা শহরের ঘনবসতিপূর্ণ স্বল্প-আয়ের জনসংখ্যা অধ্যুসিত কমলাপুর এলাকায় দৈবচয়নের (র‍্যানডম পদ্ধতি) মাধ্যমে বাড়িসমূহকে নির্বাচন করে প্রায় ৫,০০০ শিশুকে সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ (একটিভ সার্ভিলেন্স) করা হয়। প্রত্যেক সপ্তাহে মাঠকর্মীরা অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি বাড়ি পরিদর্শন করেন এবং একটি মানসম্পন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে শেষ পরিদর্শনের পর থেকে প্রত্যেক শিশুর সপ্তাহের প্রতিদিনের অসুস্থতার লক্ষণসমূহ সম্পর্কে জেনে নেন। জ্বর (পরীক্ষিত অথবা অভিভাবকের কাছ থেকে শোনা), ঘন ঘন শ্বাস বা শ্বাসকষ্ট বা নিঃশ্বাসে শব্দ হওয়া, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা বা জড়তা (লেথারজি), নীল হয়ে যাওয়া, পান করতে অসমর্থতা অথবা খিঁচুনি দেখা দিলে তাকে আইসিডিডিআর,বি-র কমলাপুর ক্লিনিকে পাঠানো হয়। একইভাবে, কাশি, নাক দিয়ে পানি পড়া, গলাব্যাথা, মাংসপেশী অথবা অস্থি-সন্ধিতে ব্যাথা, ঠাণ্ডা লাগা, মাথাব্যাথা, খিটখিটেভাব, কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া অথবা বমি হওয়ার মতো যেকোনো দু'টি সাধারণ রোগের লক্ষণ কোনো শিশুর মধ্যে দেখা দিলে তাকেও ক্লিনিকে রেফার করা হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রোগীদের সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা করা হয়েছে, তবে তাদের কাছ থেকে কোনো প্রকার অর্থ গ্রহণ করা হয় নি। যেদিন কোনো মাঠকর্মী কোনো বাড়ি পরদির্শন করতে পারেন নি, সেদিন যদি কোনো পরিবারের কোনো শিশুর অসুস্থতার কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, তাহলে শিশুর অভিভাবক যাতে স্বপ্রণোদিত হয়ে শিশুকে ক্লিনিকে নিয়ে যান সেজন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ক্লিনিকে চিকিৎসকগণ একটি উন্নত পদ্ধতিতে রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং বিশেষ কোনো ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কাউকে আরো কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরামর্শ দেন। যেসব শিশুর শরীরে তাপমাত্রা ৩৮° সেলসিয়াস বা তার বেশি ছিলো তাদের কাছ থেকে কালচার করার জন্য রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

২০০৪ সালের আগস্ট মাস থেকে মির্জাপুরে (একটি গ্রামীণ পর্যবেক্ষণ এলাকা), মাঠকর্মীরা পাঁচ বছরের কম-বয়সী প্রায় ১৩,০০০ শিশুকে প্রতি সপ্তাহে তাদের বাড়িতে গিয়ে পরিদর্শন করেন। যদি কোনো শিশু সম্ভাব্য মারাত্মক নিউমোনিয়া (দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসসহ কোনো বিপজ্জনক লক্ষণ), উচ্চ-মাত্রার জ্বর (১০২° ফারেনহাইট বা তার বেশি অথবা দু'মাসের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ১০১° ফারেনহাইট বা তার বেশি) অথবা মেনিনজাইটিস বা কোনো মারাত্মক অসুখে আক্রান্ত হয়েছে বলে সন্দেহ হয়েছে, তাহলে শিশুকে কুমুদিনী হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তির পর যারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞানুযায়ী নিউমোনিয়া, মারাত্মক নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস বা অন্য

* একটি শিশুকে তখনই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত বলে বিবেচনা করা হয়, যখন সে পান করতে অসমর্থ হয়, তার মূত্রাশয়ে সমস্যা দেখা দেয় বা তার মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্নতা, হাঁটতে অসমর্থতা, হাইপোথারমিয়া (দেহের তাপমাত্রা ৯৫° ফারেনহাইটের নিচে), সেন্ট্রাল সায়নোসিস এবং দু'বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে দ্রুত শ্বাস নেওয়া অথবা শ্বাস নেওয়ার সময় বুক দেবে যাওয়ার মতো লক্ষণসমূহ পরিলক্ষিত হয়।

কোনো মারাত্মক অসুখে আক্রান্ত হয়েছিলো তাদের কাছ থেকে রক্ত বা স্নায়ুরস সংগ্রহ করে তাদেরকে সার্ভিলেন্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০০৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৫,২২৮ জন রোগীকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং নিউমোকক্কাস রোগের ১১৭টি জীবাণু নির্ণয় করা হয় (সারণি ১)। অংশগ্রহণকারী সাতটি হাসপাতালের প্রত্যেকটি রক্ত অথবা স্নায়ুরস কালচার করে নিউমোকক্কাস জীবাণু নির্ণয় করতে সমর্থ হয়। *হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা* টাইপ বি নামের অন্য একটি জীবাণু, যার বিরুদ্ধে একটি কার্যকর টিকা পাওয়া যায়, সেটিও উল্লিখিত হাসপাতালসমূহের পরীক্ষা থেকে প্রায়ই পাওয়া গেছে (সারণি ১)। সাতটি হাসপাতালের সার্ভিলেন্সে মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত রোগীদের সংখ্যা (৬৩/৭৪(৮৫%) কমিউনিটি সার্ভিলেন্সের তুলনায় (৪/৪৩(৯%) অনেক বেশি ছিলো।

সারণি ১: রোগীদের অন্তর্ভুক্তি ও পরীক্ষার ফলাফল

	৭টি হাসপাতাল	গ্রামীণ	শহরাঞ্চল
সংজ্ঞানুযায়ী (অন্তর্ভুক্তির জন্য উপযুক্ত) রোগীর সংখ্যা	১৯,৩২২	১,৬৬৯	৫,৯৩১
রক্ত/স্নায়ুরসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এমন রোগীর সংখ্যা	৮,৬২২	১,০২৭	৫,৫৭৯
উপযুক্ত রোগীদের মধ্যে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রোগীদের সংখ্যার অনুপাত (%)	৪৪.৬	৬১.৫	৯৪.১
ব্যাকটেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গেছে এমন রোগীর সংখ্যা	৬৬১	৩২	৩০২
ব্যাকটেরিয়া নির্ণয়ের হার	৭.৭	৩.১	৫.৪
নির্ণীত নিউমোকক্কাস জীবাণুর সংখ্যা	৭৪	১০	৩৩
নিউমোকক্কাস নির্ণয়ের হার (%)	০.৯	১.০	০.৬
নির্ণীত ব্যাকটেরিয়াগুলির মধ্যে নিউমোকক্কাস জীবাণুর অনুপাত	১১.২	৩১.৩	১০.৯
নির্ণীত *হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি* টাইপ বি জীবাণুর সংখ্যা	৬০	৬	১
হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি- নির্ণয়ের হার	০.৭	০.৫৮	০.০২
নির্ণীত ব্যাকটেরিয়াগুলির মধ্যে *হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি* টাইপ বি-এর অনুপাত	৯.১	১৮.৮	০.৩

হাসপাতাল এবং কমিউনিটিসমূহ থেকে নির্ণীত জীবাণুগুলোর মধ্যে ওষুধ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিলো একই ধরনের (এ-সংক্রান্ত কোনো উপাত্ত এখানে দেখানো হয় নি)। বেশিরভাগ (৭২%) জীবাণুই কোট্রাইমোক্সাজোল-এর বিরুদ্ধে সংবেদনহীন (রেজিস্ট্যান্ট) ছিলো যা পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের শ্বাসতন্ত্রের মারাত্মক সংক্রমণের চিকিৎসায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত প্রথম সারির ওষুধ (৬) (চিত্র ১)।

কমিউনিটি সার্ভিলেন্সে অন্তর্ভুক্ত রোগীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নিউমোকক্কাল সেরোটাইপগুলো হাসপাতাল সার্ভিলেন্সে অন্তর্ভুক্ত সেরোটাইপগুলো থেকে আলাদা ছিলো। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যেসব রোগীর মধ্যে নিউমোকক্কাস জীবাণু পাওয়া গেছে তাদের ৩০%-কে বাজারজাতকৃত সাতটি সেরোটাইপসমৃদ্ধ সেভেন-ভ্যালেন্ট টিকা (৪, ৬বি, ৬এ, ৯ভি, ১৪, ১৮সি, ১৮এফ, ১৯এফ, ২৩এফ) দ্বারা এবং ৪৫%-কে নয়টি সেরোটাইপসমৃদ্ধ নাইন-ভ্যালেন্ট টিকা (৪, ৬বি, ৬এ, ৯ভি, ১৪, ১৮সি, ১৮এফ, ১৯এফ, ২৩এফ, ১, ৫) দ্বারা প্রতিরোধ করা যাবে যা গাম্বিয়ায় পরীক্ষা করা হয়েছে। কমিউনিটিতে নির্ণীত নিউমোনিয়া রোগের ৪০% সাতটি সেরোটাইপসমৃদ্ধ টিকা দ্বারা এবং ৫৮% নয়টি সেরোটাইপসমৃদ্ধ টিকা দ্বারা প্রতিরোধ করা যাবে।

চিত্র ১: জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি সকল প্রজাতির নিউমোকক্কাস জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা

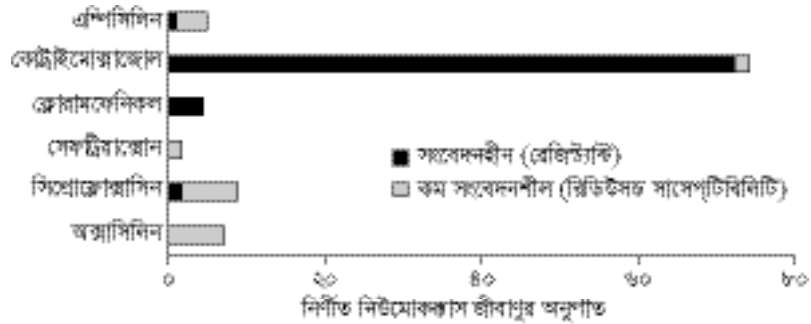

প্রতিবেদক: ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল; শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; কুমুদিনী হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল এবং পিআইডিভিএস, হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: জনস্ হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিনস অ্যাকসিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইনট্রোডাকশন প্ল্যান (নিউমোএডিআইপি)-এর মাধ্যমে গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনস অ্যান্ড ইম্যুনাইজেশন

মন্তব্য

নিউমোকক্কাস জীবাণু নির্ণয় করা যেহেতু সাধারণ অবস্থাতেও কঠিন, সেহেতু নিউমোকক্কাল সংক্রমণের একটি বিরাট অংশ এখন পর্যন্ত অজানা রয়ে গেছে। তবে এই সার্ভিলেন্স কার্যক্রম থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের যেসব এলাকায় পদ্ধতিগতভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে তার সবগুলো স্থানেই খুব গুরুত্বপূর্ণ এই নিউমোকক্কাস জীবাণু পাওয়া গেছে। হাসপাতালে পরিচালিত গবেষণায় অধিকাংশ নিউমোকক্কাস জীবাণু মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত রোগীদের মধ্য থেকে পাওয়া যায়। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের তুলনায় মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত রোগীদের কাছ থেকে কালচারের মাধ্যমে নিউমোকক্কাস জীবাণু সনাক্ত করা বেশি সহজ (৫)। তবে নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া সনাক্ত করা আরো কঠিন, যা অপেক্ষাকৃত বড় ধরনের স্বাস্থ্যসমস্যার কারণ। টিকার কার্যকারিতা-সম্পর্কিত গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, নিউমোকক্কাস জীবাণু অন্তত ২০% মারাত্মক নিউমোনিয়ার জন্য দায়ী (৪,৭)।

সেরোটাইপের বণ্টন থেকে বোঝা যায় যে, বর্তমানে প্রচলিত টিকা দ্বারা বাংলাদেশে মারাত্মক নিউমোকক্কাস রোগের অধিকাংশ সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। বস্তুত কমিউনিটি থেকে প্রাপ্ত ৫৮% নিউমোকক্কাল জীবাণু বর্তমানে প্রচলিত ভ্যাকসিন দ্বারা প্রতিরোধ করা যাবে যা নিউমোকক্কাল রোগ সংক্রমণের একটি বড় অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ২০গুণ বেশি নিউমোনিয়া-আক্রান্ত দেশে ৫৮% জীবাণু প্রতিরোধকারী টিকা যদি কার্যকরভাবে চালু করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের শিশুদের বেঁচে থাকার ওপর তা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে।

দেহের বাইরে (ইন ভিটরো) কোট্রাইমোক্সাজোল ওষুধের বিরুদ্ধে নিউমোকক্কাল জীবাণুর প্রতিরোধের উচ্চ হার থেকে বোঝা যায় যে, নিউমোকক্কাল সংক্রমণে, বিশেষ করে মারাত্মক কোনো অসুখের লক্ষণ রয়েছে এমন ক্ষেত্রে, প্রথম সারির ওষুধ হিসেবে এটি প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। বেশিরভাগ ওষুধ-প্রতিরোধক নিউমোকক্কাল জীবাণুর সেরোটাইপগুলো টিকা তৈরির ফরমুলাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধ-প্রতিরোধী নিউমোকক্কাস জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত রোগীর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া ওই দেশে কার্যকর নিউমোকক্কাল টিকা প্রয়োগের একটি ফল (৮)।

এটিও উল্লেখযোগ্য যে, এই সার্ভিলেন্স কার্যক্রমের আওতায় নিউমোকক্কাস রোগী সন্ধানের সময় অনেক হিব জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে। হিব-এর বিরুদ্ধে কার্যকর একটি টিকাও পাওয়া যায়। বাংলাদেশে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, যেসব শিশুকে হিব টিকা দেওয়া হয়েছিলো তাদের ৫০% পুরুলেন্ট মেনিনজাইটিসের বিরুদ্ধে এবং ৩৪% নিউমোনিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছিলো (৯)। নিউমোনিয়া যেহেতু বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর অন্যতম একটি কারণ এবং পুরুলেন্ট মেনিনজাইটিসে মৃত্যুহার অনেক বেশি, সেহেতু বাংলাদেশে হিব টিকা প্রচলনের মধ্য দিয়ে শিশুদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা উল্লেযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

নিউমোকক্কাস, হিব এবং রোটাভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর টিকাসহ জীবন-রক্ষাকারী কতিপয় নতুন টিকা উচ্চ আয়ের দেশসমূহে নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে এসব নতুন, নিরাপদ এবং কার্যকর টিকা প্রচলনের মধ্য দিয়ে শিশুদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হতে পারে এবং এভাবে শিশুদের বেঁচে থাকা-সংক্রান্ত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) অর্জন করা এ-দেশের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। তবে প্রত্যেকটি টিকা উল্লেখযোগ্য ব্যয় বহন করে। নিউমোকক্কাস রোগের টিকা প্রয়োগ স্থানীয়ভাবে কার্যকর এবং সাশ্রয়ী হবে কি না তা অনুসন্ধান করা হলে এই দেশে নিউমোকক্কাল টিকা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা এবং দাতাগোষ্ঠীর জন্য সময়মত তথ্য-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক তা হবে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন।

ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত নির্বাচিত মাতৃস্বাস্থ্য-সূচক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মরত মাঠকর্মীদের দ্বারা ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত ব্যাপক জনসংখ্যা-নির্ভর উপাত্ত ব্যবহার করে আমরা মাতৃমৃত্যু এবং সেবাদানকেন্দ্র-ভিত্তিক প্রসবের আনুমানিক হার বের করেছি। এরপর এই হারকে বাংলাদেশ মাতৃস্বাস্থ্যসেবা এবং মৃত্যুহার-সংক্রান্ত সমীক্ষা (বাংলাদেশ ম্যাটারনাল হেলথ সার্ভিসেস অ্যান্ড মর্টালিটি সার্ভে) এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের মাধ্যমে সংগৃহীত ফলাফলের সাথে তুলনা করেছি। ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্ণীত মাতৃমৃত্যুর হার জাতীয় বা অন্যান্যভাবে পাওয়া হার থেকে ৫০% কম, কিন্তু এ-সংক্রান্ত বিভাগীয় হারের মধ্যে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এবং কিছু এলাকায় সেবাদানকেন্দ্র-ভিত্তিক প্রসবের প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী দেখা যায়। উপজেলা পর্যায়ে মাতৃমৃত্যু-সংক্রান্ত বাৎসরিক পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা যায় কি না আমরা তাও মূল্যায়ন করেছি। মাতৃমৃত্যু সংখ্যার বাৎসরিক হিসাবে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এবং ব্যাপক কনফিডেন্স ইন্টারভেল উপজেলা পর্যায়ের মাতৃমৃত্যু হারের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের জন্য সরকারের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি আছে। তবে এর মাধ্যমে সংগৃহীত মৃত্যুহার সুক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে যা ভবিষ্যতে ভৌগলিক পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে।

ব্যাপকতর একটি স্বাস্থ্যব্যবস্থার কার্যাবলি মূল্যায়ন এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য মাতৃমৃত্যুর হার এবং দক্ষ জনশক্তি দ্বারা প্রসব করানোর হার গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে কাজ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মরত মাঠকর্মীদের দ্বারা ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের (১) মাধ্যমে সংগৃহীত ব্যাপক জনসংখ্যা-নির্ভর উপজেলাভিত্তিক উপাত্ত ব্যবহার করে আমরা উল্লিখিত দু'টি সূচকের আনুমানিক জাতীয় হার নির্ণয় করেছি। এরপর এই হারকে বাংলাদেশ মাতৃস্বাস্থ্যসেবা এবং মৃত্যুহার-সংক্রান্ত সমীক্ষা (২) এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের (৩) মাধ্যমে সংগৃহীত ফলাফলের সাথে তুলনা করেছি।

ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জনসংখ্যার নমুনা তৈরি করা যায় না, তবে বয়সভিত্তিক বাসগৃহের সব অধিবাসী, তাদের জন্ম, মৃত্যু, লিঙ্গ এবং গর্ভ-সংক্রান্ত বাৎসরিক হিসাব নির্ণয়ের চেষ্টা করা যায়। মাতৃমৃত্যু নির্ধারণে মাঠকর্মীদের যেসব বিষয় জানার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় সেগুলো হলো, প্রজননক্ষম কোনো বিবাহিত মহিলা তাঁর গর্ভকালীন সময়ে বা প্রসবের ৪২ দিনের মধ্যে মারা গেছেন কি না; এক্ষেত্রে গর্ভকালীন জটিলতার সময়কাল, মৃত্যুর স্থান বা ব্যবস্থাপনার ত্রুটির ফলে সৃষ্ট জটিলতা, ইত্যাদি যাই থাকুক না কেন এধরনের সব মহিলাকেই হিসাবের মধ্যে আনা হয়েছে। তবে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুকে এর মধ্যে আনা হয় নি (১)। ভারবাল অটোপসি দ্বারা এর বৈধতা যাচাই করা হয় না। বাংলাদেশ মাতৃস্বাস্থ্যসেবা এবং মৃত্যুহার-সংক্রান্ত সমীক্ষায় কর্মরত সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীরা জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা থেকে প্রজননক্ষম যেসব মহিলা পূর্ববর্তী তিন বছরের মধ্যে মারা গেছেন তাঁদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যেসব মৃত্যু-সম্পর্কে জানা গেছে সেগুলো থেকে ভারবাল অটোপসির মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের জন্য জাতীয়ভাবে প্রতিনিধিত্বকারী ২,০০০টি প্রাথমিক নমুনা এককের নমুনা ব্যবহার করেছে। সব ভাইটাল ঘটনাসমূহ নথিভুক্ত করার জন্য স্থানীয় নিবন্ধনকারীর মাধ্যমে প্রত্যেকটি প্রাথমিক নমুনা এককের অন্তর্ভুক্ত ২৫০টি বাড়ি পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-প্রণীত বিভিন্ন রোগের আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাগের ওপর ব্যাখ্যাসম্বলিত বই-এর দশম সংস্করণে মাতৃমৃত্যুর যে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে স্থানীয় নিবন্ধনকারীদের

তা অনুসরণ করতে বলা হয় (৩)। এরপর স্থানীয় তদারককারীদের দ্বারা সংগৃহীত উপাত্তের গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়।

আলোচ্য প্রতিবেদনে বাংলাদেশের ছয়টি প্রশাসনিক বিভাগের প্রত্যেকটির অন্তর্গত দু'টি করে গ্রামীণ উপজেলা থেকে সংগৃহীত ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। পাঁচ বছরব্যাপী (১৯৯৮-২০০৩) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা-সম্পর্কীত সেক্টর কর্মসূচির আওতায় একটি নতুন তথ্য পদ্ধতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আইসিডিডিআর,বি-র সাথে যুগ্মভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত একীভূত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি শাখাকর্তৃক দু'টি করে উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে (৪)। উপজেলাসমুহে আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের অবকাঠামো ছিলো উক্ত বিভাগের অন্যান্য উপজেলাসমূহের মতো একই ধরনের। ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যেকটি বিভাগের দু'টি করে উপজেলার তিন বছরের সংগৃহীত মোট উপাত্ত যোগ করে মাতৃমৃত্যুর হার নির্ণয় করা হয় এবং পরে পুরো বিভাগের প্রক্ষেপণ তৈরি করা হয়। আনুমানিক এ-হিসাবসমূহের সাথে বাংলাদেশ মাতৃস্বাস্থ্যসেবা এবং মৃত্যুহার-সংক্রান্ত সমীক্ষার প্রতিবেদনে প্রকাশিত হিসাবের মধ্যে অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় (সারণি ১)। তবে ব্যতিক্রম দেখা যায় শুধু একটি বিভাগে। এ-ধরনের অসমতা সংগৃহীত উপাত্তের নির্ভুলতা সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ফলে এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সন্দেহ থেকে যায়।

*সারণি ১: ভৌগলিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বিভাগওয়ারী মোট জনসংখ্যা, বিবাহিত মহিলা, জীবিত সন্তান প্রসব, মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা এবং হার**

বিভাগ	মোট জনসংখ্যা	মোট বিবাহিত মহিলা	মোট জীবিত জন্ম	মোট মাতৃমৃত্যু	মাতৃমৃত্যুর অনুপাত		
					জিআর**	বিএমএইচএস	পার্থক্য (%)
বরিশাল	৯০৮,১২৯	১৪৪,৩৪৭	২১,০৪২	৯	৪৩	৩৮৭	৮৯ (-)
চট্টগ্রাম	১,৩৬০,৪৪৩	২১১,১৫৭	৩৩,৮৬৬	২৩	৬৮	৩২৫	৭৯ (-)
ঢাকা	১,৮৮৫,৯৯৮	৩২৩,৩৮৫	৪৭,৬০০	৯০	১৮৯	৩২০	৪১ (-)
খুলনা	১,২৪২,৪৪৭	২৩৬,৬৮৫	২৪,৭২৩	৩২	১২৯	৩৫১	৬৩ (-)
রাজশাহী	১,৪৭০,২৬৯	২৫৬,২৮৭	৩৮,৫১৪	১০২	২৬৫	২২৩	১৯ (+)
সিলেট	১,২১৫,৩১০	৩২৩,৩৮৫	৩০,৩৯৬	৫২	১৭১	৪৭১	৬৪ (-)
সর্বমোট	৮,০৮২,৫৯৬	১,৪৯৫,২৪৬	১৯৬,১৪১	৩০৮	১৫৯	৩২২	৫১ (-)

* প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে ** প্রতিটি বিভাগের দু'টি উপজেলার তথ্যের ভিত্তিতে বিভাগীয় হারসমূহ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।
(-) নিম্ন, (+) উচ্চ

বাংলাদেশ মাতৃস্বাস্থ্যসেবা ও মৃত্যু-সংক্রান্ত সমীক্ষা এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের কোনোটিই উপজেলা পর্যায়ের মাতৃমৃত্যুর হার নির্ধারণ করে না, শুধুমাত্র ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত হার উপজেলা পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত মীরসরাই এবং অভয়নগর উপজেলার মাতৃমৃত্যুর হারসমূহকে মতলব উপজেলার মাতৃমৃত্যুর হারের সাথে তুলনা করা হয়েছে যেখানে আইসিডিডিআর,বি-র একটি বড় ধরনের সার্ভিলেন্স পদ্ধতি চালু রয়েছে (৫)। মতলবের উপাত্তের সাথে তুলনা করা হয়েছে কারণ, ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের বাইরে কেবলমাত্র এখানেই উপজেলা

পর্যায়ের মাতৃমৃত্যুর হার পাওয়া যায়। প্রত্যেক বছর উল্লেখযোগ্যভাবে এ-সংখ্যা বাড়ে ও কমে এবং উভয় পদ্ধতিতেই কনফিডেন্স ইন্টারভেল অনেক বেশি (সারণি ২)। পরবর্তী বছরগুলোতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকর্তৃক সংগৃহীত তথ্যে মাতৃমৃত্যুর হার বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

সারণি ২: মীরসরাই, অভয়নগর ও মতলবে (ইন্টারভেনশন এবং কম্পারিজন এলাকা) মোট মাতৃমৃত্যু, জীবিত সন্তান সংখ্যা এবং আনুমানিক মাতৃমৃত্যুর হার এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জাতীয় মাতৃমৃত্যুর হার (আনুমানিক)*

এলাকা/বছর	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৫	মোট
মীরসরাই						
মাতৃমৃত্যু	১৫	১৩	২৩	১১	২০	৮২
জীবিত জন্ম	৮,৬২১	৮,৭৪৪	৯,০৮৩	৮,৯০৬	৯,১৪৮	৪৪,৫০২
মাতৃমৃত্যুর হার	**১৭৪**	**১৪৯**	**২৫৩**	**১২৪**	**২১৯**	**১৮৪**
৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল	(৯৪-২৭৭)	(৭৭-২৪৭)	(১৫৬-৩৬৯)	(৬০-২১৫)	(১৩৩-৩৩৭)	(১৪৩-২২৩)
অভয়নগর						
মাতৃমৃত্যু	১	৮	১২	৩	৬	৩০
জীবিত জন্ম	৪,৬১৯	৪,৯২০	৫,১৫৬	৫,০২২	৫,০৩৬	২৪,৮২৫
মাতৃমৃত্যুর হার	**২২**	**১৬৩**	**২২৩**	**৬০**	**১১৯**	**২১২**
৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল	(৫-১১৬)	(৬৮-৩১৩)	(১১৬-৩৯৪)	(১৩-১৮৭)	(৩৬-২১৪)	(৭৮-১৬৮)
মতলব (কম্পারিজন)						
মাতৃমৃত্যু	১৩	৩	**	**	**	১৩১
জীবিত জন্ম	৩,০৮৬	৩,০০১	**	**	**	৩৬,২৪৮
মাতৃমৃত্যুর হার	**৪২১**	**১০০**	**	**	**	**৩৬১+**
৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল	(২২৪-৭২০)	(২১-২৯২)	**	**	**	(৩০০-৪২৩)
মতলব (ইন্টারভেনশন)						
মাতৃমৃত্যু	৬	২	**	**	**	৭৬
জীবিত জন্ম	২,৬১২	২,৮০৯	**	**	**	৩১,৮৯০
মাতৃমৃত্যুর হার	**২৩২**	**৭১**	**	**	**	**২৩৮+**
৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল	(৮৫-৫০৪)	(৯-২৫৭)	**	**	**	(১৮৮-২৯৮)
বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরো						
মাতৃমৃত্যুর হার	**৩২৯**	**৩২৬**	**৪১৭**	**৪০২**	**	**

* প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে

+ ১৯৯১-২০০১ সালের হার

** তথ্য পাওয়া যায় নি

ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত বিভাগওয়ারী সেবাদানকেন্দ্র-ভিত্তিক প্রসব-প্রবণতার বাৎসরিক হিসাবও আমরা পরীক্ষা করেছি এবং বাংলাদেশ মাতৃস্বাস্থ্যসেবা ও মৃত্যুহার-সংক্রান্ত সমীক্ষার উপাত্তের সাথে তার তুলনা করেছি। ভৌগলিক পর্যবেক্ষণে প্রসবের স্থান হিসাবে বাড়ি অথবা হাসপাতাল/ক্লিনিককে দেখানো হয়েছে। চিত্র ১-এ বিভাগওয়ারী ফলাফলের উচ্চমাত্রার তারতম্য দেখানো হয়েছে।

চিত্র ১: ভৌগলিক পর্যবেক্ষণ (২০০০-২০০২) এবং বাংলাদেশ মাতৃস্বাস্থ্যসেবা এবং মৃত্যুহার-সংক্রান্ত সমীক্ষা (২০০১) অনুযায়ী বিভাগওয়ারী সেবাদানকেন্দ্র-ভিত্তিক প্রসব-প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার বাৎসরিক হিসাব

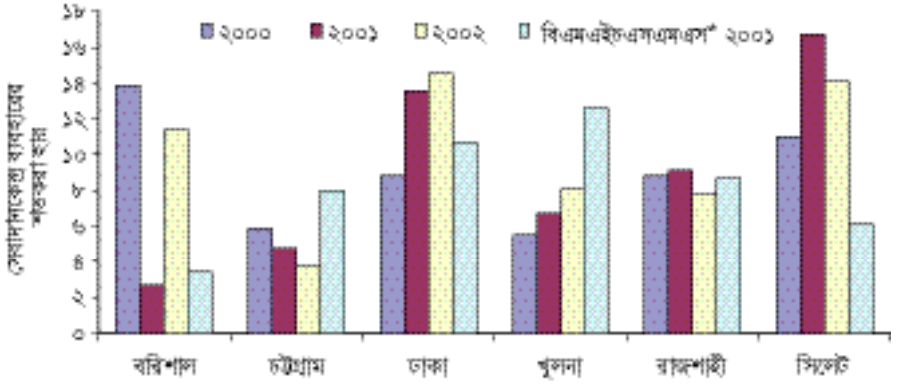

* বাংলাদেশ ম্যাটারনাল হেলথ সার্ভিসেস অ্যান্ড মর্টালিটি সার্ভে

উপজেলা পর্যায়ের ব্যবস্থাপকবৃন্দ স্থানীয়ভাবে বাৎসরিক মাতৃমৃত্যু হারের পরিবর্তনসমূহ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন কি না তা নির্ধারণের জন্য ভৌগলিক পর্যবেক্ষণে আমরা সেবাদানকেন্দ্রে প্রসব করাতে আসা মায়েদের সংখ্যা পরীক্ষা করে দেখেছি। বিভাগীয় পর্যায়ের মতো বাড়িতে প্রসব করানোর প্রবণতা আগের মতোই প্রাধান্য পেয়েছে, তবে মীরসরাই এবং অভয়নগরে সেবাদানকেন্দ্র-ভিত্তিক প্রসবসংখ্যা একইভাবে বেড়ে যাচ্ছে (চিত্র ২)।

চিত্র ২: ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত অনুযায়ী মীরসরাই এবং অভয়নগরে সেবাদানকেন্দ্র-ভিত্তিক বাৎসরিক প্রসব

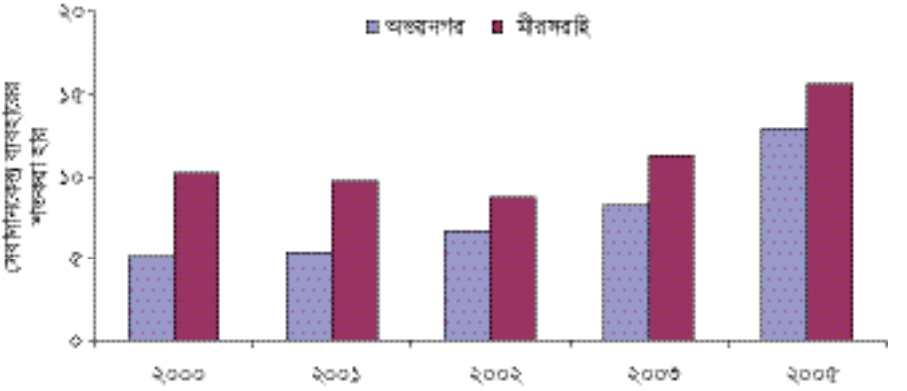

বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছর ধরে সবধরনের জরুরি প্রসূতিসেবার আওতা বাড়ানোর লক্ষ্যে যথেষ্ট কাজ করা হয়েছে। এর ফলে উপজেলা পর্যায়ে বর্তমানে সরকারি ব্যবস্থাপনায় চালু রয়েছে এমন

অনেক সেবাদানকেন্দ্রের সেবার মান উন্নত হয়েছে এবং যথাযথ সোদানকারীসহ নতুন সেবাদানকেন্দ্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সেবাদানকেন্দ্র-নির্ভর স্বাভাবিক প্রসব এবং অস্ত্রপচারের সাহায্যে প্রসব-সংখ্যাও বেড়েছে। উপজেলা পর্যায়ের ব্যবস্থাপকবৃন্দ দ্বারা মাতৃস্বাস্থ্যসেবা ব্যবহারের বাৎসরিক পরিবর্তন-সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব কি না তা নির্ধারণের জন্য মীরসরাই এবং অভয়নগর উপজেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্যও আমরা মূল্যায়ন করেছি।

সেবাদানকেন্দ্র ব্যবহারের হার বের করার জন্য ভৌগলিক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত সব জীবিত জন্মের সংখ্যাকে বিভাজন (ডিনোমিনেটর) হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেকোনো সেবাদানকেন্দ্রে সেবা নিতে আসা গর্ভবতী মহিলাদের সংখ্যা মীরসরাইয়ে ছিলো ১৪% এবং অভয়নগরে ছিলো ২৪% যা জাতীয় হার থেকে বেশি। যেসব মহিলা যেকোনো সেবাদানকেন্দ্রে সেবা নিতে এসেছেন তাঁদের মধ্যে মীরসরাইয়ে ৪৮% এবং অভয়নগরে ৩৫% মহিলার স্বাভাবিক প্রসব হয়েছে। উভয় উপজেলায় বেশিরভাগ (৮৫%-এর বেশি) স্বাভাবিক প্রসব হয়েছে সরকারি সেবাদানকেন্দ্রে এবং অস্ত্রপচারের মাধ্যমে বেশিরভাগ (৯০%-এর বেশি) প্রসব করানো হয়েছে বেসরকারি সেবাদানকেন্দ্রে।

প্রতিবেদক: হেলথ সিস্টেমস্ অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূতপূর্ব একীভূত ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি ইউনিট

মন্তব্য

ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত নবজাতক এবং নবজাতকোর্ধ শিশুমৃত্যুর হারের মতো জনমিতি-সংক্রান্ত অন্যান্য সূচকেও ভুল পাওয়া যায় (৬)। এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে, একই সূত্র থেকে প্রাপ্ত মাতৃমৃত্যুহার-সংক্রান্ত উপাত্তের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন আছে। ফলো-আপ ভারবাল অটোপসি, পর্যাপ্ত পেশাগত তদারকি এবং সুক্ষ্ম-বিশ্লেষণ ব্যাতিরেকে মাতৃমৃত্যুহার-সংক্রান্ত উপাত্ত থেকে পাওয়া ফলাফলের ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। মন্ত্রণালয়ের মাঠকর্মীরা সবাই মাতৃমৃত্যুর একই সংজ্ঞা অনুযায়ী উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। তথাপি, তাদের দ্বারা সংগৃহীত উপাত্ত থেকে পাওয়া মাতৃমৃত্যুর হারের সাথে বিকল্প উপায়ে পাওয়া হারের ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া কিছু বিভাগের হারের সাথে অন্য উপায়ে আরো সুক্ষ্মভাবে সংগৃহীত হারের মিল রয়েছে। এই বিভাগগুলি ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের কাজ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করে কি না, বা করলে কেন, তা পরিষ্কার নয়। উপজেলা পর্যায়ের জনসংখ্যায় মাতৃমৃত্যুহারে কাঙ্খিত ওঠা-নামা ছাড়াও ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হারে যেসব কারণে তারতম্য থাকতে পারে সেগুলো হলো, মাতৃমৃত্যু চিহ্নিতকরণে ভুল করা, সীমিত যাচাইয়ের কারণে অন্যের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মৃত্যু সম্পর্কে জানা এবং সব পর্যায় থেকে সংগৃহীত উপাত্তের গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য অপর্যাপ্ত সুক্ষ্ম-বিশ্লেষণ ব্যবস্থা। শুধুমাত্র মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা বের করার জন্য উপাত্ত সংগ্রহ করলে তা স্থানীয় ব্যবস্থাপকদের দ্বারা কম খরচে আরো তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, সংগৃহীত সব মাতৃমৃত্যুই বাড়ি পর্যায়ে প্রমাণিত হওয়া উচিত এবং স্বাধীন বিশ্লেষক দ্বারা উপাত্তের গুণাগুণ বিচার করা উচিত। মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মরত মাঠকর্মীরা যেহেতু স্থানীয় বাসিন্দা, সেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের সব মৃত্যু বাড়ি পর্যায়ে প্রমাণ করতে তারা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন।

ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের একটি সুবিধা হলো এই যে, এর নমুনার আকার অনেক বড় এবং ফলে এর থেকে অধিকতর স্থিতিশীল মাতৃমৃত্যুহার বের করা সম্ভব। তবে এটি সেই ধরনের বড় আকারের নমুনা যা থেকে মৃত্যু-সংক্রান্ত বৈধ উপাত্ত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কারিগরি এবং লজিস্টিক সমস্যা রয়েছে। ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের জন্য বরাদ্ধকৃত সম্পদ অধিকতর কার্যকর হতে পারে এমন কোনো উপায়ে উপাত্ত সংগ্রহের কাজে পুনঃবরাদ্ধ করার কথা সরকারকে বিবেচনা করা উচিত। বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরো যেসব এলাকায় স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করে সেসব এলাকায় বাৎসরিক ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উক্ত উভয় পদ্ধতিতে সংগৃহীত উপাত্তের গুণগত মান মূল্যায়নের সুযোগ থাকতে পারে।

বাংলাদেশ জনমিতিক ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা এবং বাংলাদেশ মাতৃস্বাস্থ্যসেবা ও মৃত্যু-সংক্রান্ত সমীক্ষার কোনোটিতেই উপজেলাভিত্তিক কোনো জনমিতি ও স্বাস্থ্যসূচক না থাকার দরুন উপজেলা-ব্যবস্থাপকদের দ্বারা উপাত্ত সংগ্রহের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, যাতে উপজেলা-ব্যবস্থাপকবৃন্দ তাঁদের কর্মসূচির পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর নমুনা এলাকায় বাৎসরিক ভৌগলিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ জনমিতি এবং স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত সূচকসমূহের পরিসংখ্যানের মাধ্যমে উভয় পদ্ধতির কার্যাবলি বৃদ্ধি করা যায় এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি উপজেলা ব্যবস্থাপকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করতে পারে।

সেবাদানকেন্দ্রভিত্তিক স্বাভাবিক প্রসব এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে অস্ত্রপচারের মাধ্যমে প্রসবের হার বেড়ে যাওয়া, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মহিলাকে অন্যত্র প্রেরণ করা এবং লাভজনক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্ত্রপচারের মাধ্যমে প্রসব-সংক্রান্ত উপাত্ত সরকারি তথ্য-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়সমূহ সতর্কভাবে গবেষণা করা দরকার। সরকারি অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সেবাদানকেন্দ্র-ভিত্তিক প্রসব এবং অস্ত্রপচারের মাধ্যমে প্রসব-সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য মাতৃমৃত্যুহার কমানো-সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন।

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাদকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো প্রতিফলিত হয়। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্যগবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: জুন ২০০৫-মে ২০০৬

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা=১৯০)	*ভি. কলেরি* ০১ (সংখ্যা=৭৮৪)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৩১.৬	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৯৮.৯	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৫৬.৮	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৪০.০	২.৭
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১০০.০	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	২৫.২
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	২৯.২
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.১

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ***০১***, শিগেলা *এবং রোটাভাইরাস-এর তুলনামূলক চিত্র: জুন ২০০৫-মে ২০০৬*

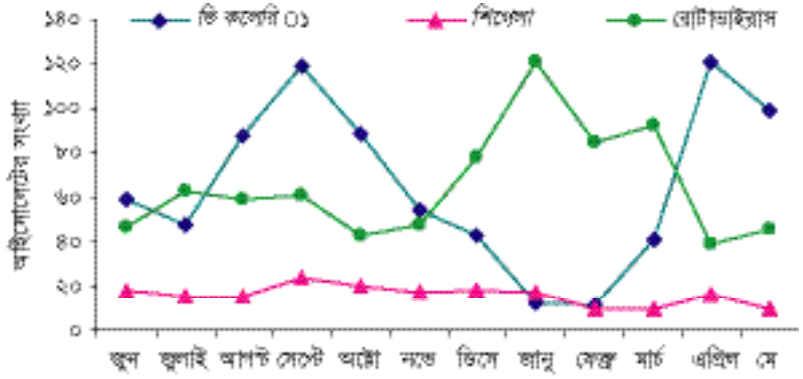

১০২টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ধরন: সেপ্টেম্বর ২০০৪-মার্চ ২০০৬

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		
	প্রাইমারি (সংখ্যা=৮৮)	একোয়ার্ড* (সংখ্যা=১৪)	মোট (সংখ্যা=১০২)
স্ট্রেপটোমাইসিন	২৭ (৩০.৭)	৪ (২৮.৬)	৩১ (৩০.৪)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	১২ (১৩.৬)	৪ (২৮.৬)	১৬ (১৫.৭)
ইথামবিউটল	৮ (৯.১)	২ (১৪.৩)	১০ (৯.৮)
রিফামপিসিন	৯ (১০.২)	৪ (২৮.৬)	১৩ (১২.৭)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	৩ (৩.৪)	৩ (২১.৪)	৬ (৫.৯)
অন্যান্য ওষুধ	৩৭ (৪২.০)	৭ (৫০.০)	৪৪ (৪৩.১)

( ) শতকরা হার *১ মাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এন. গনোরিয়া জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬ (সংখ্যা=১৫)

জীবাণুনাশক ওষুধ	সংবেদনশীল (%)	কম সংবেদনশীলতা (%)	রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা (%)
এজিথ্রোমাইসিন	১০০.০	০.০	০.০
সেফট্রিয়াক্সোন	১০০.০	০.০	০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১৩.৩	০.০	৮৬.৭
পেনিসিলিন	৪০.০	৩৩.৩	২৬.৭
স্পেক্টিনোমাইসিন	৮৬.৭	১৩.৩	০.০
টেট্রাসাইক্লিন	৬.৭	১৩.৩	৮০.০
সেফিক্সিম	১০০.০	০.০	০.০

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: ফেব্রুয়ারি - এপ্রিল ২০০৬

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীলতা সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	১০	১০ (১০০.০)	০	০ (০.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	১০	৬ (৬০.০)	০	৪ (৪০.০)
ক্লোরামফেনিকল	১০	৯ (৯০.০)	০	১ (১০.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	১০	১০ (১০০.০)	০	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১০	১০ (১০০.০)	০	০ (০.০)
জেন্টামাইসিন	৯	০ (০.০)	০	৯ (১০০.০)
অক্সাসিলিন	৯	৯ (১০০.০)	০	০ (০.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি এবং শিশু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর এবং আইসিডিডিআর,বিকর্তৃক ঢাকার কমলাপুর ও টাঙ্গাইলের মির্জাপুর এলাকায় পরিচালিত নিউমোএডিআইপি সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী শিশুদের থেকে সংগৃহীত।

আইসিডিডিআর,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কেন্দ্রের পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকুল্যে এইচএসবি-এর এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (অসএইড), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ক্যানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সৌদি আরব, নেদারল্যান্ডস, শ্রীলংকা, সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ এজেন্সি (সিডা), সুইস ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

ছবি : নিউমোএডিআইপি সার্ভিলেন্সের অন্তর্ভুক্ত হাসপাতালসমূহের একটিতে কর্মরত ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানবৃন্দ (সৌজন্যে: ডা. আলিয়া নাহিদ)

সম্পাদকমণ্ডলি	স্টিফেন পি. লুবি পিটার থর্প এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
সম্পাদনা বোর্ড	চার্লস পি. লারসন এমিলি গারলী
যাঁরা লেখা দিয়েছেন	রুচিরা তাবাস্‌সুম নভেদ স্টিফেন পি. লুবি আলী আশরাফ
অতিথি সম্পাদক	আলিয়া নাহিদ
কপি সম্পাদনা, বাংলা অনুবাদ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা	এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা
পেজ লে-আউট, ডেস্কটপ ও প্রি-প্রেস প্রসেসিং	মাহ্‌বুব-উল-আলম

আইসিডিডিআর,বি: সেন্টার ফর হেলথ্ অ্যান্ড পপুলেশন রিসার্চ
জিপিও বক্স নং ১২৮
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

এ-সংখ্যাটির পিডিএফ এবং পূর্ববর্তী সকল সংখ্যার পিডিএফ-এর জন্য আমাদের ওয়েব সাইট ভ্রমণ করুন:
www.icddrb.org/hsb